# ডায়েরীর একপাতা

শ্রীসুশীল কুমার সিদ্ধান্ত

২য় বর্ষ বিজ্ঞান-ক

.....খুট্-খুট্-খটাং। কারাগৃহের রুদ্ধ প্রাচীরের দ্বার খুলে প্রহরী এল ঘরের ভিতরে, অন্ধকারের মধ্যে। শাসনদণ্ডের পিঞ্জর থেকে পালিয়ে না যাই—তা' দেখাই তার কাজ। বেতনভুক্ ভৃত্য তার নিজের কাজ শেষ করে চলে যায়—গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে। হিংসা হয় তার ঐ মুক্ত, স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিবিধি দেখে।

কর্ম্মের চাকা ঘুরে চলেছে—ঘর্‌র্ ঘর্‌র্। মানুষ নিজেকে করেছে সম্পূর্ণ দাস কর্ম্মের—নিজেকে জুড়েছে চোখ বাঁধা বলদের মত কর্ম্মের ঘানিতে। আজও ভোর হয়। পূব আকাশে আবীর খেলার ছড়াছড়ি লেগে যায়। পাখী গান করে। কিন্তু মনে হয় আমার কতকাল ধরে দেখিনি প্রকৃতির মুক্ত লীলা। শৈশবের হাঁসিকান্না বিজড়িত দিনগুলিকে মনে হয় স্বপ্ন। কোথায় সেই পাখী ডাকা ঘুম ভাঙ্গানী গান? তার পরিবর্ত্তে খালি প্রহরীর রূঢ় কর্কশধ্বনি শুনে ভূমি শয্যা ছেড়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিতে হয় বৈদেশিক রাজ্ঞীর প্রতিনিধিকে। কোথায় সেই সুন্দর ঝল্‌মলে রৌদ্র, আর নীল আকাশের সাদা টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ—আনাগোনা। তার পরিবর্ত্তে অন্ধকার কুঠুরীতে বসে উপরদিকে চেয়ে ছাদের কড়িকাঠ গোনা। মনে পড়ে ছোট্ট ঝুম্‌কি নদীর কথা। তারই পাড়ে বসে কত সন্ধ্যা আনমনে কাটিয়ে দিয়েছি—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ সোণালী রশ্মির বিচিত্র খেলায় মুগ্ধ হয়ে। কখন গোধূলি এসেছে—গরুর খুরের ধূলো মিলিয়ে গেছে আকাশে—পাখীর ডাকলী ক্ষীয়মান হতে হতে কখন মিলিয়ে গেছে—আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটী একটী করে তারার মালা যেন নীল শাড়ীর ওপরে মোতির ফুল, কখন গৃহস্থ বধূ তুলসী তলায় প্রদীপ জেলে ভগবানকে নিবেদন করেছে তার নিষ্কলঙ্ক চিত্তের নির্ম্মল শ্রদ্ধা—জান্‌তে পারিনি। কোথায় কোন সুদূরে কোন কল্পনার অপরূপ মায়ালোকে উধাও হয়ে গেছে মন। খেয়াল হয়েছে—যখন সন্ধ্যার শান্ত, স্নিগ্ধ—একটা হাওয়া এসে গৃহে ফেরার বার্ত্তা কানে কানে বলে চলে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে ধীরে ধীরে নদীর শান্ত, নিথর বুকের 'পরে। আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে গিয়েছি বিষণ্ণ ভরাতুর চিত্তে। সেই সব মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে এসে জমা হয়ে ভীড় জাগিয়ে তোলে। হৃদয় ভরে ওঠে একটা বিষণ্ণ হতাশায়। দেহে পাইনা বল, মনে পাইনা আশা।

মনে হয় ডাক্ ছেড়ে কাঁদতে পারলে হৃদয়ের ভার কিছু লঘু হয়। কিন্তু তাও পারি না। ভাব্‌বার সময় নাই। বৈদেশিক রাজার সুশাসনে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্য করবার ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে দিতে হয় নিজেকে ডুবিয়ে।

দিন চলে যায়……। সময় কারও জন্য বসে থাকে না। কিন্তু আমার দিন আর কাটে না এক একটী দিন যেন এক একটী সুদীর্ঘ যুগ— শেষ নাই যার।

কতদিন বাড়ী ছেড়ে এসেছি। বহুদিন কারাজীবনের সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। আরও কতদিন হবে জানি না। সেদিন যাচ্ছিলাম বাগানের দিকে একটু বেড়াতে। পথে যেতে যেতে দেখা হল জেলার বাবুর সঙ্গে। হেসে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, "আপনাদের সময় ত' হয়ে এল, সুজিৎবাবু। কিন্তু এখনও প্রায় ৬ মাস দেরী আছে জান্‌লাম জিজ্ঞাসা করে।" শুনে মুখটা একটু মলিন হল বোধ হয়। তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন "আরও একটু আগে হলে ভাল হ'ত না?" আমি উত্তর দিলাম, "ভালত হতই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু উপায় যখন নেই তখন বড় কর্ত্তাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কি করা যায় বলুন?"

সত্যি, এক সময় মনে হয় আত্মহত্যা করি। এই আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত ও জীর্ণ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। সেদিন দেখা করেছিলাম একজন রাজবন্দীর সঙ্গে। ভদ্রলোক ৭ বছর আছেন। চোখ দুটো কোটরগত। মুখের চোয়াল ভেঙ্গে চেহারা হয়েছে বিশ্রী। দেখলে বোঝা যায় একসময় দেহের বর্ণ গৌর ছিল, কিন্তু এখন রোদে পোড়া তামাটে। মুখে নেই হাঁসি। সব সময় মুখ নীচু করে থাকেন। বল্লেন, দেখ হাঁসতে আমি ভুলে গেছি। ৭ বৎসর ধরে একদিনের জন্যও হাঁসিনি আমি। বেঁচে থাক্‌লে অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায় পৃথিবীতে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল অন্ধকূপে পচে জীর্ণদেহ ও মন নিয়ে আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এটাও পৃথিবীর একটা আশ্চর্য্য নয় কি? আমার এক এক সময় নিজেরদিকে তাকিয়ে নিজেকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।" শুনে বহুকষ্টে অশ্রু রোধ করলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।

যেখানে তাকাই সেখানেই একটা নির্ম্মম শাসন, একটা বিশ্রী বন্ধন শৃঙ্খলিত করেছে আমাকে। কারাগৃহের এই নিঃশ্বাসরোধকারী অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কবে মুক্তির আলো প্রাণের বার্ত্তা বহন করে এনে মনের ভিতর বুলিয়ে দেবে তার সোণার কাঠির মায়া পরশ, তার অপেক্ষায় থেকে থেকে হয়ে গেছি হতাশ। এ জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর থেকেও অসহ্য। সব সময় কে যেন আমার টুঁটী চেপে ধরে নিজের করায়ত্ত করে নিয়ে যেতে চায় অনন্ত অন্ধকারের গর্ভে। সেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, নেই সেখানে প্রাণের সুন্দর জীবনের প্রচণ্ড জীবনীশক্তি। এক পা এক পা করে কোন অনির্দ্দেশ্য শান্ত-

দাতা এগিয়ে আস্‌ছে তার অমোঘ দন্ত বিধান করার জন্য। পলে পলে, তিল তিল করে চলেছি বিনাশের সর্ব্বনাশা পথে। অন্ধকারে পাই যেন কার সন্তর্পণ পদ সঞ্চারের শব্দ। উঃ! অসহ্য, অসহ্য এ জীবন। কেউ যদি একহাতে বিষভাণ্ড নিয়ে আর এক হাত দিয়ে বিরাট, অসীম অন্ধকার সমুদ্রের দিকে নির্দ্দেশ করে' আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্‌টী আমি চাই, তাহলে আমি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, হাঁসিমুখে আদরে বরণ করে নেব ঐ বিষভাণ্ড যা একবার পান করলে চাইতে হবে না এই অন্ধকারের দিকে। একেবারে যেয়ে পৌছব যেখানে, সেখানে রোগ নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রনা নেই, স্বার্থপরতা নেই, অন্ধকার নেই, আর নেই রাজদ্রোহীর দণ্ডদাতা তার ভীষণ দণ্ড নিয়ে ভীষণ উগ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে।

মানুষ ততক্ষণই থাকে স্বস্তিতে যতক্ষণ সে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সুখের দিনের সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা না করে কিন্তু যখনই সে অতীতের সুখের কিংবা ভবিষ্যতের উচ্চাশা বা সফলতা লাভের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনকে পাশাপাশি স্যাজিয়ে চায় বিচার করতে; তখনই তার চিত্ত হয় অস্থির, একটা অধীর উন্মত্ত আবেগ তাকে করে তোলে চঞ্চল, বর্ত্তমান অসফলতার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে করে আপ্রাণ চেষ্টা আর সে চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত পরিনতি লাভ করতে পারে আত্মহত্যায়।

আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। অতীতের সঙ্গে যখন তুলনা করি তখন হতাশার নিদারুণ আগুনে পুড়তে থাকি। কিছু আর ভাল লাগেনা। অশ্রু প্রবাহ তখন আমার অপার দুঃখকে আমার হৃদয়-ভাঙ্গা বিফলতার বিলাপকে পারেনা রূপ দিতে। বুকের ভিতরে বিরাট হতাশায় গুম্‌রে মরতে থাকে ঘনীভূত কান্না। মনে পড়ে ছোটবেলায় একদিন কোন একটা মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা ছবি দেখে খুব হেঁসেছিলাম। ছবিতে আছে—একটা মোটা লোক কোনও ওষুধ সেবন করে সাধারণ দেহে পেয়ে দেহের ও মনের লঘুতায় ছুট্‌ছে—গতিবেগে তার ছাতা পড়েছে ছিট্‌কে—টুপিটা উটেছে আকাশে। নীচে লেখা ছিল—কি ছিলাম আর কী হয়েছি! আজও আমার জীবনের দিকে তাকালেই সেই ছবিটা দেখতে পাই! আমিও ভাবি, "কী ছিলাম আর কী হয়েছি।" একটী সূক্ষ্ম হাঁসির রেখা আপনা হতেই আমার অজ্ঞাতেই ভেসে ওঠে ঠোঁটের কিনারায়—উঠেই আবার মিলিয়ে যায় হাঁসি বটে, কিন্তু মনে হয় কাঁদতে পারিনা বলেই হাসি। কে জানত যে আমার জীবনও ঠিক এই ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভের আশায় অপেক্ষা করছে। আমি হয়ে গেছি জীবন-বিদ্বেসী। জীবনের প্রতি এসেছে তীব্র ঘৃণা, মমতার পরিবর্ত্তে। আমি এখন মানুষ খুন করতে পারি অনায়াসে। এক সময় যখন বইয়ে পড়েছিলাম যে দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মানুষ মানুষ থাকে না—হয়ে যায় বনের হিংস্র পশু। তখন বিশ্বাস করতে পারিনি

এখন আমি এর যাথার্থ্য স্বীকার করতে কণামাত্র কুণ্ঠিত নই। আমার এই অবিশ্বাসের সঙ্গে লেখকের কথার যাথার্থ্যের যুদ্ধ চল্‌ছিল তখন বিধাতাপুরুষ বোধ হয় অলক্ষে মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কে জান্‌ত যে এই নিদারুণ সত্যের কঠোর পরীক্ষা হয়ে যাবে আমার এই জীবনে। একেই বলে নিয়তির পরিহাস!

খুব ছোটবেলাকার কথা আমার মনে পড়ে না। যখন স্কুলে পড়তাম তখন খেলাধুলায় ছিলাম সবচেয়ে ভাল। দৌড়ঝাপ, লাফালাফি মারামারী সব জিনিষে ছিলাম অদ্বিতীয়। sportএ সব কটা প্রাইজ নিয়ে যখন বাড়ী ফিরে মায়ের পায়ের কাছে প্রাইজের জিনিষগুলো নামিয়ে রেখে প্রনাম করতাম, মা আদর করে 'চুমু' খেতেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি আমি তখন। বাবা বলতেন খালি বইয়ের বোঝা বয়ে স্কুলে যেয়ে আর দিনরাত ঘরের কোনে বসে বই মুখস্থ করে ক্লাসে ফাষ্ট হওয়ার মধ্যে 'ভালছেলেমি' থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই। বাবার উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করেছি। সেই জন্য শুধু খেলাধুলায় না, পড়াশুনাও নাম ছিল আমার।

কতদিন পাজী ঘোড়া শায়েস্তা করবার জন্য, ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেছি মাইলের পর মাইল দুপর রৌদ্রের মধ্যে। আবার ফিরে এসেছি ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত দেহে। ফিরে এসে পেয়েছি মার কাছ থেকে সস্নেহ তিরস্কার।

বৈশাখ মাস। চারিদিকে আগুন ছুটছে দুপুরে! বাহিরে ধুলোর ঝড়। বাতাস থেকে থেকে বেগদিয়ে উঠে আবার নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। সকলে ঘুমিয়ে নিজের নিজের ঘরে। মার পাশে শুয়ে আছি আর বাতাস খাচ্ছি। মা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। হাতের পাখাটা এসে পড়েছে আমার গায়ের ওপর, হাত থেকে খসে! নিঃশব্দে পাখাটাকে যথাস্থানে রেখে পা টিপে টিপে বাইরে চলে গেছি প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তিকে অগ্রাহ্য করে—আম বাগানে! যেখানে যত বিপদছিল সেখানে ঝাঁপ দিতেই ছিল, আমার তত আনন্দ বর্ষাকালে নুতন বর্ষার জলবোয়ে নদী দিক্ বিদিক্ ভাসিয়ে নিয়ে তার খরস্রোত বয়ে চলে অপ্রত্যাহত গতিতে, তখন নদী পারাপার করেছি সাঁৎরে, নৌকা বেয়ে চলে গেছি ডাঙ্গাতে ফিরে আসছি উজান বেয়ে নদীর খরস্রোতকে পরাভূত করে। জ্যৈষ্ঠের প্রথমে চলে গেছি ভোর বেলায়, অন্ধকারের মধ্যে ঝরা বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথার জন্য! সরস্বতী পূজোর দিন সবচেয়ে আগে সবচেয়ে ভাল ফুল সংগ্রহ করা ছিল আমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সেই বকুল গাছতলার শান বাঁধান বেদীটা আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে। বোসেদের আমবাগান মিত্তিরদের ঘাট, রামেদের সেই নেড়া তালগাছটা, নয়ানজুলীর মাঠ, রাধারমনের মন্দির এখনও মনের কোণে ভীড় জাগিয়ে তোলে।

আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙান বিবেকানন্দের পাগড়ী মাথায় দেওয়া ছবিটা, আমার টেবিল, চেয়ার, আল্না, বাক্স এমনকি ভোলা কুকুরের হাঁপিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবার দৃশ্যটা পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

কাজলদীঘির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। সেদিন দীঘির ঠিক মাঝখানে ফুটেছিল এক প্রকাণ্ড পদ্ম। কেমন যেন রোখ্ চেপেছিল ওই ফুলটা আন্বার জন্য। ফুলটা নিয়ে আসবার সময় আর আসতে পারিনা। পায়ে লতাপাতা জড়িয়ে গেছে। বহু কষ্টে সেদিন উদ্ধার পাই। শীতকালের সকালে সকলে মিলে রোদে পিঠ দিয়ে মুড়ি লঙ্কা চিবোনো, দুপুরে, দলবেঁধে নুন লঙ্কা সহযোগে কুলগাছের কুল শেষ করে দেওয়া—এ স্মৃতি কোন দিনও কি ভুলতে পারি? আমার পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ ছবি, মন জড়ানো শ্যামলতা, বাঁশঝাড় আর আম বাগান মন্দির আর নদীর তীর—এর মৃত্যু আমার অসহ্য।

ছোটবেলায় যখন বড় বড় বীরদের যুদ্ধ জয়ের কাহিনী, অজানা দেশের আবিস্কারের অভিমান আর বড় বড় দেশ প্রেমিকের আত্মোৎসর্গের কাহিনী শুনতাম তখন কত কল্পনাই মনে ছিল। আমি ভাবতাম্ আমি হব প্রতাপ সিংহের মত, শিবাজীর মত কয়েকটা বীর অনুচর নিয়ে করব বিরাট রাজ্যের সূচনা। অথবা চলে যাব জাহাজে করে উত্তর মেরুতে বরফের রাজ্যে, এস্কিমোদের দেশে। সেখানে খালি বরফ আর বরফ। শ্বেতভাল্লুক আর সিন্ধু ঘোটকের নিরাপদ বাসস্থানে আমরা হব মূর্ত্তিমান বিভীষিকা। অথবা চলে যাব আফ্রিকার গহন বনে। প্রকৃতির কোলে মুক্ত, স্বাধীন পশুদের চিড়িয়া খানা দেখতে। অথবা চলে যাব সুউচ্চ হিমালয়ে মাউণ্ট এভারেষ্টে অধিকার করতে। কিংবা নেপোলিয়নের মত বিরাট বাহিনী নিয়ে সমস্ত বিশ্ব অধিকার করে বসব। অথবা গান্ধীর মত ছোট লোকদের নিয়ে করব সত্যাগ্রহীর দল—যারা করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান কিংবা বিবেকানন্দের মত হিন্দু ধর্ম্মের গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা করে বেড়াব উদাত্ত স্বরে। বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের আর একটা পরিচয় করিয়ে দেব।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Man proposes God disposes। মানুষ যা ভাবে তা যদি সব সময় বাস্তবে পরিণত দেখতে পারত তা হলে পৃথিবীতে এত অশান্তির কোলাহলের শান্তি হত। কিন্তু তা হবার নয়। সকলের অলক্ষ্যে অদৃষ্ট ভাগ্যের নৌকা নিয়ে বেয়ে চলেছে যেদিকে তার খুসী। তাকে ফেরাবার সাধ্য কারও নেই। মানুষ যখন নিজের শান্তির উপর প্রচণ্ড বিশ্বাসবান হয়ে অসাধারণ কিছু একটা করবার জন্য—ব্যগ্র হয়ে ওঠে—অদৃষ্ট দেখে আর হাঁসে—দেখে হেঁসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

একটা প্রশ্ন আমার এই এতভাগ্য বন্দী মনে জেগে উঠেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে "শান্তি কোথায় ?" শান্তি কি এই বিরাট যন্ত্রদানবের বিরাট ব্যপ্তির মধ্যে—কলকারখানার বিকট মুখব্যাদানের মধ্যে ? বিজ্ঞানের দান—সুদৃশ্য অট্টালিকা, ট্রাম; বাস, মেসিনগান আর কামান—এরাই কি শান্তি-স্থাপনের অগ্রদূত। Politicsএর কূটতর্ক Socialism আর Commupism, Fassion আর Imperialismএর বড় বড় বুলি আউড়ে সারা দেশের নেতা হয়ে উঠতে চান। তাদের উদ্দেশ্য কি শান্তি না আর কিছু। বাঁধাবাঁধির মধ্যে থেকে মানুষ যায় হাঁপিয়ে। দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষার বাহিরেওযে মনের একটা ক্ষুধা আছে সেটা বৈজ্ঞানিক মানুষ প্রায়ই ভুলে যায়—লোহালক্কড়ের ঝন্‌ঝনানির মধ্যে নিজেকে দেয় ডুবিয়ে। কিন্তু মন তাহার নির্ম্মম প্রতিশোধনের কিছুদিন পর যখন যৌবনের জোয়ার ভাটার ছোঁয়াচ লাগে। যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা উদ্যম আর সে রকম থাকে না। মানুষ হয়ে যায় সমুদ্রের মাঝখানে পাল ছেড়া ভাঙ্গা, পুরোনো জাহাজের মত। কোথায় যাবে তার স্থিরতা নেই কিন্তু গতিবেগ আছে। মানুষ তখন নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে ভীষণ রকম। একজন সাথী পেতে চায় সে, যে তার দগ্ধ, শুস্ক প্রাণে বুলিয়ে দেবে স্নেহের মায়া প্রলেপ—প্রাণে ছুঁইয়ে দেবে নির্ম্মল আনন্দের সোনার কাঠি।

কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে সাময়িক ভাবে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। একদিন আসে যখন সে চিন্তা সুরু করতে বাধ্য হয়, ভাবে—বিজ্ঞানের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে, কি আমি পেয়েছি! নদীর উপর পুল বেঁধেছি, জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েছি। কুড়ে ঘরের যায়গায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈয়ার করেছি, পালের নৌকার যায়গায় জাহাজ করেছি, জল-প্রপাতের প্রচণ্ড জলধারাকে আয়ত্ত করে করেছি বিদ্যুতের সৃষ্টি। কিন্তু তার পর! আমি যাব, আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করবে আর একজন সেও নিজেকে দেবে বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি। কিন্তু আমাকে মনে রাখবে কে? আমি মরলে হয়ত খবরের কাগজে আমার ছবি উঠবে। আমার আত্মীয় স্বজন আমার ক্ষণিক অভাব বোধ করবে। তারপর? জগৎ যেমন ছিল তেমনই চলবে। আবার সূর্য্য উঠবে পাখীরা গান করবে। রাজপথে তেমনি কোলাহল চলবে, ট্রাম বাস মটরের সেই রকম, বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দ সমান তালে চল্‌তে থাকবে। এ বিরাট পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায়? তাহলে আমি কেন এসেছি? কেন? কার জন্য! এই প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মানুষ হয়ে যায় দিশেহারা। জগতের প্রতি, জগতের অধিবাসীর প্রতি জেগে ওঠে তীব্র অভিমান সে হয়ে যায় নিষ্ঠুর, উন্মাদ।

বসে বসে ভাবি আর ভেবে দিশে হারা হয়ে যাই। প্রহরী হেঁকে যায়। কুলীরা ঘড়্ ঘঁড়্ করে ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিয়ে যায়। খাবার ঘণ্টা পড়ে খাই, শোওয়ার ঘণ্টা পড়ে শুই। কোন বৈচিত্র্য নেই, একঘেয়ে।

মনে পড়ে সেই গাছপালায় ঢাকা ছোট গ্রামখানির কথা, শৈশবের স্বপ্ন আর স্মৃতি মনের মাঝে জট পাকিয়ে তোলে। সুনীলের কথা মনে পড়ে। ও আর আমি মিলে কত গল্প করেছি বুড়ো বটগাছটার তলায় বসে। সন্ধ্যাবেলায় রাধারমনের মন্দিরে আরতির ধোঁয়ায় আর বিচিত্র লোকের সমাবেশে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে কতদিন ওখানে। সেনেদের চণ্ডীমণ্ডপ ওখানে পূজোর সময় কত আমোদ করেছি।

কতদিন চলে গেছি বোসেদের আমবাগানের ভিতর দিয়ে। রায়দের বাড়ীর সামনে দিয়ে বুড়ো, তেঁতুল গাছটার পাশ দিয়ে, চলে গেছি সোজা শ্মশানটা ছাড়িয়ে রেল লাইনের পাশে, মাঠে, সেখানে শিমূলগাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আপন মনে বাঁশী বাজিয়েছি কতক্ষণ! আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছি মেঘের গায়ে রংয়ের সঙ্গে রংয়ের লুকোচুরী।

তারপর সন্ধ্যা নেমে এসেছে, দূর গ্রাম থেকে কাঁসর শঙ্খধ্বনির শব্দ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়, আকাশ নীলবসনা সুন্দরীর মত মুক্তা খচিত বসন পরে হাঁসছে। পাতার ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ জ্যোৎস্না গায়ে এসে পড়েছে। চমকে উঠে বাড়ী চলে গিয়েছি। কতদিন শরতের মেঘের অপূর্ব্ব শোভা দেখতে দেখতে মাঠে চলে গিয়েছি খেলতে। মেঘ শিশুরা যেন আজ দীর্ঘকাল শাসন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে পাগল হয়ে ছুটোছুটি মাতামাতি করছে। বর্ষার দিনের সজল কাজল মেঘের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বাড়ী ফিরে আসার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ছোট ছোট ভাই বোনদের কথাবার্ত্তা, তাদের হাঁসিমুখ। মার কথা মনে পড়লে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনা। মনে পড়ে আমার আসবার সময়ে বাবার মলিন মুখের কথা।

হয়ত আমিও একদিন ফিরব। কিন্তু যে আশা, উদ্যম ও দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কারাগৃহে ঢুকেছিলাম তার পুঁজি আজ নিঃশেষিত প্রায়। আজ চলতে পা কাঁপে, চোখে ভাল দেখতে পাইনা পাঁচ বৎসর আগে আমি যে মানুষ ছিলাম তার সঙ্গে এখনকার "আমি"র তুলনা করে হাঁসি আসে। হয়ত ফিরে যাব গ্রামে সেই মা বোন ভাইদের কাছে। মা হয়ত চোখে আঁচল দেবেন। বাবা হয়ত সইতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। ভাই বোনেরা হয়ত বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকবে এই শীর্ণদেহ আগন্তুকের পানে।

আমি তখন তাদের আর দাদা হতে পারব না। হয়ে যাব একটা অদ্ভুত ছবি। পূর্ব্বে জেলে ঢোক্‌বার সময় যারা আমাকে তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিদায় দিয়েছিল, তারাই হয়ত দেখলে আমাকে আজ চিন্‌তে পারবে না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাস বুক ফাটা দুঃখে গুম্‌রে গুম্‌রে মরছে। তার মধ্যে পাই আমি চির হতাশার সকরুণ নিঃশ্বাস। কি যেন হারিয়ে গেছে—তা আর পাবনা।

---

# বহে যাও নদি

অধ্যাপক পুলিনবিহারী কর

'Flow down cold riverlet'—Tennyson's In Memoriam.

বহে যাও নদি, সাগর পানে
নিয়ে তব উপচার ;
বিদায়ের দিন, এই মোর শেষ
কভু না আসিব আর।
ধীরে বহে যাও শ্যামল প্রান্তরে
সরিৎ ; তটিনী পরে ;
তব তটে এই আসিব না আর
চির জনমের তরে !
ঝাউ সারি সারি দুধারে তোমারি
পবনের স্বন্ স্বন্,
বনফুল মাঝে অলির গুঞ্জন
শুনিবে গো চিরন্তন।
শত সৌরকর ভাসিবে সলিলে
নাচিবে চন্দ্রমা পটে ;
আমি কিন্তু আর কভু এ জীবনে
আসিব না তব তটে।

—:—